দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 25 APR 1990
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2

কোথায় চলেছে বাংলাদেশ

আবদুল খালেক

বাংলাদেশ সরকারের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ও সুখ্যাতির বড়াই বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্টে ও প্যারিসে কনসার্টিয়াম বৈঠকে ভূ-লুন্ঠিত হলো। কতেক কর্মকাণ্ডের নমুনা দেখেশুনে দাতা দেশগুলো এবারকার সাহায্যদানে শুধু বশ্যতামূলক মিতালির শর্ত আরোপ করেনি প্রতিশ্রুত সাহায্যের ব্যবহারে মনিটারিং করার ইঙ্গিত ব্যক্ত করেছে। অভিযোগ ছিল, বাংলাদেশে প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, প্রশাসনিক অযোগ্যতা ও দুর্নীতি পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, অনুৎপাদক খাতে যথেচ্ছ ব্যয় বেড়ে গেছে, শিশু ও মহিলা উন্নয়নে উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে পণ্য ও খাদ্য সাহায্যের পাল্টা তহবিল খেয়ালখুশীমত ব্যয় করা হয়েছে ইত্যাদি। সরকার পক্ষ এসব অভিযোগ খণ্ডন করতে পারেননি বলে গতবারের চেয়ে প্রায় শতকরা বিশ ভাগ কম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়েই দেশে ফিরেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর বৃদ্ধির উপদেশও। এবারকার কনসর্টিয়াম বৈঠকে আমাদের অর্থনীতির নাড়িভূঁড়ি যেভাবে টেনে বের করা হয়েছে এবং দাতাদের পছন্দমতো পুনঃ সংস্থাপনের কড়া কথা বলা হয়েছে তাতে আমাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগতে পারে বৈকি। সরকার সে আঘাত পেয়েছেন কি না জানি না। যাই হোক, আমাদের অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া যে দূষিত ও কলুষিত হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে বিদেশীরা এবার মোটামুটি স্পষ্টভাষী হয়েছেন বলা চলে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের চেতনা ও কর্মোদ্যোগ বিকাশের চালিকাশক্তি নিহত হওয়ার বড় কারণ হিসেবে উচ্চমহলে দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অযোগ্যতা ও স্বেচ্ছাচার চিহ্নিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। দেশের সুধীজন এসব ব্যাপার বার বার তুলে ধরেছেন, কিন্তু তাতে ফললাভ হয়নি। সরকার বেপরোয়া হয়ে সনাতন কুপথেই এগিয়ে চলেছেন। শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে দেশের সাধারণ মানুষের চেতনা জাগিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। সরকার শিক্ষাকে দেশের উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেননি। যার ফলে, দেশে দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন-মানসের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক জীবনের প্রবাহে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় কাঙ্ক্ষিত প্রশাসন পদ্ধতির ধারাপথে আমরা এগুতে পারিনি সুদীর্ঘ স্বৈরশাসনের দাপটে। জনগণের সার্বভৌমত্ব ও মৌলিক অধিকারের সংগ্রামেই আমাদের ক্ষীণ জীবনীশক্তিটুকু নিয়োজিত রয়েছে বছরের পর বছর ধরে। পার্শ্ববর্তী সার্কভুক্ত দেশ নেপালকে দেখেও আমাদের চেতনা হচ্ছে না। বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের পটভূমিকায় আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান কত নাজুক তা সহজেই অনুমেয়। ভিক্ষুকের বেশে দেশের এক বিরাট অংশ বেরিয়ে পড়েছে শহর-বন্দরের পথেঘাটে, আর সরকারও ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন বিশ্বের বড় বড় রাজধানীতে। কেউ মৃদুমন্দ তিরস্কার দিয়ে এবং কেউ যৎকিঞ্চিৎ দান-খয়রাত দিয়ে বিদায় দিচ্ছেন আমাদের মান্যবরদেরকে। এতেও আমাদের চেতনার উদয় হচ্ছে না। আমন্ত্রিত বিদেশীদের সংবর্ধনায় আমরা প্রাণ ঢেলে দেই ও জৌলুস দেখাতে রাজস্ব ভাণ্ডার খুলে দেই। লক্ষ্য, এর পরিবর্তে কিছু দান সাহায্য পাওয়া। জোরজবরদস্তি করে আমরা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে সুসজ্জিত রাজপথে সারিবদ্ধ করি ও তরুণীদের গানে ও নাচে পরিবেশ মুখরিত করি এবং নদীপথে বিলাসভ্রমণের ব্যবস্থা করি। দেশের ভুখা-নাঙ্গা-হাড্ডিসার লোকগুলোকে লুকিয়ে রাখি, তাদের খুপরি-খুপরি উচ্ছেদ করি অথবা অন্যভাবে ঢেকে রাখি। এসব কথা দাতা দেশ সংস্থা নিশ্চয় সফরে আগত বিদেশী মেহমানদের কাছে গোপন থাকে না।

ইংরেজরা আধুনিক প্রশাসন পদ্ধতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের যে ধারণাটুকু রেখে গেছেন তারই পথ ধরে হাজারো সমস্যাবিজড়িত ভারত গণতন্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষার মানের দিক থেকে ভারত উন্নত বিশ্বের প্রায় সমকক্ষ বললে অত্যুক্তি হবে না। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর দুই বছরের মাস্টারস ডিগ্রী এবং গবেষণার ব্যবস্থা ব্যাপক। কলেজে শুধু তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রীর এবং উচ্চ মাধ্যমিককে স্কুলের সঙ্গে সংযোজনের ব্যবস্থা চালু করেছে। সুদক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলার ব্যাপক ব্যবস্থা ভারতীয় শিক্ষানীতির একটি বিশেষ দিক। ভারতীয় শিক্ষার পাঠক্রম উন্নত বিশ্বের তালে তালে প্রণীত এবং এর কার্যকর প্রয়োগ প্রশ্নাতীত। তবে আমরা দারিদ্র্যের প্রসার ঘটিয়েছি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের জন্ম দিয়েছি, শিক্ষার প্রসারে ও মানোন্নয়নে চরম ব্যর্থতার সাক্ষ্য রেখেছি। নামমাত্র "কলম-ধরা" শিক্ষিতদেরকে হিসেবে ধরেও চার দশকে শিক্ষিতের হার শতকরা পঁচিশের ওপর উঠাতে পারিনি। গণমুখী শিক্ষানীতির অনুপস্থিতিতে ও শিক্ষাকে অনুৎপাদক খাত হিসেবে গণ্য করার কারণে এই সর্বনাশা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। স্মর্তব্য যে, স্বৈরশাসকরা শিক্ষাকে বিভিন্ন কৌশলে দাবিয়ে রাখেন নিজেদের স্থিতিশীলতা দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশেও তাই হয়েছে।

আমাদের শিক্ষার মান বিশ্বের তুলনায় কী অবস্থানে আছে তার মূল্যায়ন করবেন পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ। এটা জানি যে, আমাদের মেডিক্যাল ডিগ্রীর আন্তর্জাতিক অবস্থান মোটেও ভাল নয়। ১৯৬৯-১৯৭০ সালে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির যে প্রবাহ বয়েছে পরবর্তীকালে তার জের মিটেনি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে ছাত্রসমাজের অবদান জাতির জন্যে গৌরব বৈ আর কিছু নয়। ১৯৭২ সালের সংক্ষিপ্ত পাঠক্রমভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কি ছিল না, তা নিয়ে বিতর্ক জন্মেছে। কিন্তু ঐ বছর থেকে পরীক্ষায় নকলবাজির প্রতি অত্যধিক প্রবণতা দেখা যায় যার ক্রমবর্ধমান বিকাশের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের পরীক্ষা সিস্টেম একটা নিছক তামাশায় পরিণত হয়েছে। পরীক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং ভাড়াটিয়ারা মিলে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রী ইত্যাদি পরীক্ষাকে একটা প্রহসনে পরিণত করেছে আমাদের সবাইর চোখের সামনে।

লাঠিসোটা, ছুরি, রামদা, শাবল, বোমা, ইটপাটকেল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল "নকল বাহিনী" বনাম "পুলিশ-আনসার ম্যাজিস্ট্রেট বাহিনীর" খণ্ডযুদ্ধে আহত-নিহত, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং সম্পত্তির ভাঙচুর ও জ্বালানি-পোড়ানির দৃশ্যপটে বাংলাদেশের স্কুল-মাদ্রাসা কলেজ ও আরো অনেক শিক্ষালয়ের আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা সম্পন্ন হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। সাম্প্রতিককালে সরকারের কিছুটা টনক নড়েছে। হাজার হাজার পরীক্ষার্থী ও কয়েক ডজন পরিদর্শকের বহিষ্কার এবং তাদের সহযোগী শত শত ব্যক্তির গ্রেফতারের খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আরো প্রকাশিত হয়েছে, পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়নে এবং নম্বর টেবুলেশনে বিরাজিত বিবিধ দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অপকর্মের টুকিটাকি খবর। প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ব্যাপার-স্যাপার বাংলাদেশে মামুলি ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষার এই দুরবস্থা দূরীকরণে পাঠক্রম ভাল করে শেখানো-পড়ানোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দেশব্যাপী অভিযোগ রয়েছে: শিক্ষালয়ের পরিবেশ লেখাপড়ার প্রতিকূল। শিক্ষকের পদ শূন্য। জ্ঞানে-গুণে ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ শিক্ষকের সংখ্যা নগণ্য। পাঠক্রমের অবাঞ্ছিত বোঝা, একাধিক ভাষার উৎপীড়ন, শিক্ষা উপকরণের অভাবও আর্থ-সামাজিক কারণে ছাত্রদের পড়াশুনায় মনোযোগের অভাব দেখা দিয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অবশ্য পাঠ্য ইংরেজী পড়াবার সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব ঘনীভূত হচ্ছে ডিগ্রী পর্যায়ে ইংরেজীকে ঐচ্ছিক করার কারণে, সন্দেহ নেই। লক্ষণীয় যে, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী অবশ্য পাঠ্য বিষয় হলেও সুদীর্ঘ বারো বছরেও সাধারণ স্তরের ছাত্ররা শুদ্ধ ইংরেজী লিখতে ও বলতে শেখে না। এজন্য অবশ্যি শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। ইংরেজী অবশ্য পাঠ্য রাখতে হলে ইংরেজী পড়াবার সুযোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের। ইংরেজীতে ফেলের সংখ্যা এখন অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। বানান বিভ্রাট এবং লিখিত ও কথ্য ভাষার গোঁজামিলে বাংলা ভাষার অবস্থাও মোটামুটি হতাশাব্যঞ্জক। বাংলা ভাষার সুদক্ষ শিক্ষকের অভাব এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী।

প্রণিধানযোগ্য যে, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনৈতিকতা ও দুর্নীতির বিরাজিত প্রবাহ থেকে শিক্ষক ও ছাত্রসমাজকে বিচ্ছিন্ন রেখে নৈতিকতা ও সততার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবু পরীক্ষায় নকলবাজি ও শিক্ষকের অনৈতিকতা দমনে কঠোরনীতি অবলম্বন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে নকলবাজিকে এবং নকলবাজিতে সাহায্যদানকে সুস্পষ্ট শাস্তিযোগ্য অপরাধের অন্তর্ভুক্ত করার সময়